INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-I, Issue-2, July-December 2025

নিষ্কাম কর্ম থেকে কর্মনৈতিকতা: গীতা-দর্শনের সমকালীন পুনর্মূল্যায়ন

*** লম্বোদর কুমার**

https://doi.org/10.5281/zenodo.18115898

সারসংক্ষেপ:

বর্তমান তীব্র প্রতিযোগিতামূলক কর্মজগতে, সাফল্য ও ব্যর্থতার উপর অত্যধিক মনোযোগের কারণে কর্মীরা ক্রমাগত মানসিক চাপ, উদ্বেগ এবং নৈতিক বিভ্রান্তি-র সম্মুখীন হচ্ছেন। আধুনিক কর্মনৈতিকতা প্রায়শই ফলাফল-কেন্দ্রিক হওয়ায় (Result-Oriented), কর্মের গুণমান এবং প্রক্রিয়ার পরিবর্তে ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতি (স্বার্থপরতা) প্রাধান্য পাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে, কর্মসম্পাদনের একটি বিকল্প, আরও স্থিতিশীল ও নৈতিক মডেলের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-এ বর্ণিত 'নিষ্কাম কর্ম' (ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে কর্তব্য পালন) এই সমস্যার একটি গভীর দার্শনিক সমাধান প্রদান করে। বর্তমান গবেষণার মূল বিষয় হলো: গীতার এই প্রাচীন নীতি কীভাবে আধুনিক পেশাগত জীবনের গতিশীল এবং স্বার্থ-নির্ভর কাঠামোর মধ্যে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা যায় এবং তা একটি উন্নত কর্মনৈতিকতার জন্ম দিতে পারে? গীতা-দর্শনের এই পুনর্মূল্যায়ন দেখায় যে, নিষ্কাম কর্ম কোনো নিষ্ক্রিয়তা বা কর্ম থেকে পলায়ন নয়, বরং এটি কর্মের প্রতি গভীরতম অঙ্গীকার। এটি ফলের জন্য কাজ না করে, কাজের জন্যই কাজ করার একটি উন্নত কর্মনৈতিকতা। গীতা কর্মীকে শেখায় যে, সর্বোচ্চ মানের কাজ করাই তার কর্তব্য, কিন্তু ফলাফলটি হলো বৃহত্তর প্রাকৃতিক বা ঐশ্বরিক ব্যবস্থার অংশ।

মূল শব্দ: নিষ্কাম কর্ম, কর্মনৈতিকতা, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, স্বধর্ম, ফলাফলে আসক্তি, সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা।

** স্টেট এইডেড কলেজ কলেজ টিচার, দর্শন বিভাগ, শালতোড়া নেতাজি সেন্টেনারী কলেজ*

ভূমিকা:

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা কেবল একটি ধর্মীয় পুথি বা আধ্যাত্মিক কথোপকথন নয়, বরং এটি মানব আচরণের মনস্তত্ত্ব এবং কর্মব্যবস্থাপনার এক শাশ্বত দলিল। হাজার বছরের পুরনো কুরুক্ষেত্রের রণঙ্গনে প্রদত্ত অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশবাণী একবিংশ শতাব্দীর জটিল কর্পোরেট ও ব্যক্তিগত কর্মজীবনেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এই গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো গীতার অন্যতম মৌলিক স্তম্ভ 'নিষ্কাম কর্ম'-এর ধারণাটি কীভাবে আধুনিক 'কর্মনৈতিকতা' বা Work Ethics-এর বুনিয়াদ হিসেবে কাজ করতে পারে, তার একটি বিশ্লেষণাত্মক এবং সমকালীন পুনর্মূল্যায়ন করা।

ভারতীয় দর্শনে 'কর্ম' একটি কেন্দ্রীয় ধারণা। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কর্মকে জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে উল্লেখ করেছেন— "ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ"[1], অর্থাৎ কর্ম না করে কেউ এক মুহূর্তও থাকতে পারে না। তবে গীতার দর্শনে কর্মের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো কর্মের প্রতি মনোভাব। এখানেই 'নিষ্কাম কর্ম'-এর উদ্ভব। নিষ্কাম কর্ম মানে কর্মত্যাগ নয়, বরং কর্মফলের প্রতি আসক্তি ত্যাগ। আধুনিক যুগে যাকে আমরা 'Duty for duty's sake' বা কর্তব্যের জন্য কর্তব্য বলি, গীতা তাকেই আধ্যাত্মিক মোড়কে উপস্থাপন করেছে। কিন্তু সমসাময়িক ব্যাখ্যায় এটি কেবল আধ্যাত্মিক মুক্তি নয়, বরং একটি সুস্থ ও দক্ষ সমাজ গড়ার চাবিকাঠি।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণাপত্রটি চিরাচরিত ধর্মীয় ব্যাখ্যার ঊর্ধ্বে উঠে গীতার কর্মযোগকে একটি ব্যবহারিক ও ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করবে। এর মূল উদ্দেশ্যগুলো হলো:

❖নিষ্কাম কর্মকে 'উদাসীনতা' হিসেবে ভুল ব্যাখ্যা না করে একে 'সক্রিয় দায়িত্ববোধ' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

❖নৈতিক অবক্ষয় রোধে গীতার দর্শন কীভাবে নিরাময়কারী ভূমিকা পালন করতে পারে তা অন্বেষণ করা।

❖ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির ঊর্ধ্বে উঠে কীভাবে একটি লোকসংগ্রহকারী (সমাজকল্যাণমূলক) কর্মসংস্কৃতি গড়ে তোলা যায়, তার রূপরেখা সন্ধান করা।

মূল বিষয়

১

গীতা কোন সম্প্রদায়ের বিশেষ ধর্মগ্রন্থ নয়, গীতা হল মানব গ্রন্থ। গীতা মানুষকে নৈতিক শিক্ষা দান করে। এই গীতা হল জীবন দর্শন, ভালো থাকার দর্শন। গীতার মূল যে শিক্ষা সেটি হল নিষ্কাম কর্ম করতে হবে। কর্ম ত্যাগ অপেক্ষা কর্ম অনুষ্ঠান শ্রেষ্ঠ। মানুষকে প্রতিনিয়ত কর্ম করতে হয়। যথাবিহিত যে কর্ম সেই কর্মের অনুষ্ঠানে ব্যক্তির পরমার্থ লাভ হয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিষ্কাম কর্ম করার উপদেশ দিয়েছিলেন এবং তাকে স্বধর্ম পালনের কথা বলেছেন। কর্মবিমুখ সন্ন্যাসীগণ বলেন জ্ঞানে মুক্তি এবং কর্মে জীবের বন্ধন। গীতায় দেখা যাচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ নিষ্কাম কর্মযোগ প্রসঙ্গে অনেকবারই জ্ঞানের কথা বলেছেন। জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র কিছু নেই। জ্ঞানে সমস্ত রকম কর্মের সমাপ্তি ঘটে, কিন্তু তিনি আবার কর্ম অনুষ্ঠানের কথাও বলেছেন। এক্ষেত্রে অর্জুনের জ্ঞান এবং কর্ম এই দুইয়ের মধ্যে কোনটি তাঁর করা উচিত এই সময় যখন তিনি কিছু বুঝে উঠতে পারেননি তখন তাঁর গুরু হিসেবে শ্রীকৃষ্ণ তাকে পরামর্শ দিয়েছেন প্রথমে আত্মজ্ঞানী হয়ে উঠতে হবে এবং তারপর কর্ম অর্থাৎ স্বধর্ম পালন করতে হবে এবং সেই কর্ম হবে অবশ্যই নিষ্কাম কর্ম। জ্ঞানী ব্যক্তির যে কর্ম সেটি হল নিষ্কাম কর্ম। অজ্ঞানী

ব্যক্তির কর্ম হল সকাম কর্ম। মানুষকে কর্ম করতে হবে, কর্মশূন্য থাকা জীবন নয়। মানুষকে তার স্বভাব অনুযায়ী কর্তব্য কর্ম পালন করতে হবে। সেই কর্তব্যকর্ম পালন করতে গিয়ে যদি সে পরাজিত হয় তাও সেটা পরধর্মের থেকে ভালো। এই নিষ্কাম কর্ম করতে গেলে প্রথমে আত্মজ্ঞানী হওয়া দরকার তবেই মুক্তি লাভ সম্ভব। নিষ্কাম কর্ম হল সেই কাজ যেটি মানবিক অঙ্গীকারের সঙ্গে করা হয়, ফল লাভের জন্য নয়। প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য কর্ম করা উচিত, কামনার বশবর্তী হয়ে নয়। কর্ম করা ব্যক্তির অধিকার এবং কর্তব্য। তাই গীতার নিষ্কাম কর্ম একমাত্র সকলের প্রযোজ্য, যার ফলে মোক্ষ লাভ বা পরমাত্মায় উত্তরণ ঘটে।

"কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভুর্মা তে সঙ্গোহস্ত্বকর্মণি" ।।[2] (গীতা-২/৪৭)

-এটি হলো গীতার নিষ্কাম কর্মতত্ত্ব। এই শ্লোকটির অর্থ হলো, কর্মে অধিকার, কর্মফলে নয়, ফলাকাঙ্ক্ষা নিয়ে কর্ম সাধন যেমন ব্যক্তির কর্তব্য নয়, তেমনি কর্ম থেকে বিরত থাকাও ব্যক্তির কর্তব্য নয়, কর্তব্য জ্ঞানে কর্তব্য সাধন হলো মানুষের উচিত কর্ম। গীতায় একমাত্র মানুষের মঙ্গল ঘটে- এই ধর্মোক্তি প্রচার করা হয়েছে। এই কর্মতত্ত্ব আস্তিক অর্থাৎ যারা ঈস্বরে বিশ্বাসী এবং নাস্তিক অর্থাৎ যারা ঈশ্বরের বিশ্বাস করেন না, সকলের কাছেই অনুসরণীয়, কারণ তা বিশ্ববাসীর কল্যাণ সাধক। ভগবদ্গীতা একই সঙ্গে দর্শন শাস্ত্র, ধর্ম শাস্ত্র এবং নীতিশাস্ত্র, কিন্তু সেখানে দর্শন এবং ধর্ম অপেক্ষা নীতিবিদ্যা বা নৈতিকতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যে উপদেশ গীতায় উল্লেখিত আছে সেখানে জ্ঞান, ভক্তি এবং কর্মের সমন্বয় ঘটেছে এবং কর্মের মাধ্যমে মানুষ কিভাবে তার পরম পুরুষার্থকে বা মুক্তি লাভ করতে পারে তা গীতায় উল্লেখিত রয়েছে। 'নিষ্কাম কর্ম' গীতার আলোচ্য বিষয়। 'কর্ম অতিরিক্ত ভাবে কর্মের কোন লক্ষ্য নেই, কর্মই একমাত্র কর্মের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য'-এটি গীতার মূল লক্ষ্য। প্রত্যেক ব্যক্তির, প্রত্যেক জাতির প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম আছে এবং কর্মের ধারা আছে এবং প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতিগত একটা বৈশিষ্ট্য আছে। প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের দ্বারা এবং কর্মের দ্বারা তার বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটে এতেই প্রত্যেক ব্যক্তির স্বার্থকতা।

প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারায় ধর্মই হলো কর্ম, কর্ম বিনা ধর্ম হয় না কিন্তু যে কর্ম মানুষের করণীয় সেই কর্ম কে অবশ্যই ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জিত, কামনা শূন্য হতে হবে। যে কর্মে কোন আসক্তি থাকবে না, কর্মফলে আসক্ত হয়ে মানুষ কোন কাজ করবে না অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মই মানুষের একমাত্র কর্ম হবে। যে কর্মের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় সংযম এবং অনাসক্তি হল সারকথা, সেই কর্ম হবে নিষ্কাম কর্ম। "কর্ম করো কিন্তু অনাসক্ত হয়ে কর্ম করো"-এটি গীতার সার। কোন প্রাপ্তির কথা না ভেবে, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমত্ত জ্ঞান আরোপ করে যিনি নিজের বা অন্যজনের প্রকৃত মুক্তির জন্য, ভাগবদ্ লাভের জন্য, আত্ম উন্নতির জন্য, ব্রহ্মজ্ঞান এবং ব্রাম্ভীস্থিতি লাভের জন্য, এছাড়া পরমাত্তা প্রাপ্তির জন্য কর্ম করেন সেই ব্যক্তির কর্মই হলো নিষ্কাম কর্ম। যে কর্মে লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয়, সুখ-দুঃখ সমস্ত কিছুতে সমত্ত বুদ্ধি আরোপ করে কর্ম করা হয় সেই কর্মই হলো নিষ্কাম কর্ম, এই প্রসঙ্গে যে শ্লোকটির কথা উঠে আসে সেটি হল- "সুখ দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়া জয়ৌ"।[3] (গীতা-২/৩৮) এই নিষ্কাম কর্ম থেকেই ধর্মের পথে যাওয়া যায়। গীতায় তৃতীয় অধ্যায় কর্মযোগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিষ্কাম কর্মের কথা বলেছিলেন এবং নিষ্কাম ভাবে কর্ম করার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন। কর্ম

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-I, Issue-2, July-December 2025

দুই প্রকার- সকাম কর্ম এবং নিষ্কাম কর্ম। যে কর্মে আশা, ফলাকাঙ্ক্ষা, কর্তৃত্বাভিমান, আসক্তি, কামনা, বাসনা জড়িত সেই কর্ম প্রকৃতপক্ষে সকাম কর্ম, যে কর্ম থেকে ধর্মের পথে যাওয়া যায় না, মুক্তির পথে যাওয়া যায় না। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম হল কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ, আসক্তি ও আকাঙ্ক্ষা বর্জিত কর্ম এবং এই কর্মের ফলে পরমাত্মায় বিকাশ সাধন সম্ভব হয়।

এই গ্রন্থে বা শাস্ত্রে দেখা যাচ্ছে যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুন মোহগ্রস্থ, বিষাদগ্রস্ত, শোকাতুর এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আছেন। এই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ যিনি অর্জুনের উপদেষ্টা বা পরামর্শদাতা বা গুরু তিনি অর্জুনকে নানা রকম উপদেশ দিচ্ছেন তাকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করার জন্য। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন কে প্রথমে আত্মজ্ঞানী হয়ে ওঠার কথা বলেছেন এবং পরে অর্জুনকে স্বধর্ম পালন করার কথা বলেছেন কথা বলেছেন এবং সমস্ত রকম কামনা-বাসনা, আসক্তি, আকাঙ্ক্ষা বর্জন করে স্থিতপ্রজ্ঞ হয়ে উঠতে বলেছেন।[4] অর্জুন যেহেতু ক্ষত্রিয় তাই তাকে ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম করতে হবে। কারণ মানুষ কখনো কর্ম না করে থাকতে পারেনা অর্থাৎ "পুনরপি জননম্ পুনরপি মরনম্ পুনরপি জননী জঠরে শয়নম্”।[5] মানুষকে প্রতিনিয়তই কর্ম করতে হয় অবশ্যই প্রত্যেক মানুষের নিজের স্বধর্ম অনুযায়ী। তাহলে সেই কর্ম সকাম কর্মের থেকে অনেক বেশি সুখের হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পরামর্শদানের মধ্য দিয়ে অর্জুনের কি কর্তব্য করা উচিত, কেমন ভাবে তাঁর চলা উচিত, অর্জুনের শোক দূর করে প্রকৃত জীবনে ফেরানোর চেষ্টা তিনি করেছেন। অর্জুনের এই মোহ, শোক দূরীকরণের চেষ্টাতেই গীতা শাস্ত্রের উদ্ভব। অর্জুনের এই মোহকে উপলক্ষ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র মানবজাতির কল্যাণকর এই অপূর্ব ধর্মতত্ত্ব জগতে প্রচার করেছিলেন। প্রথমত, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আত্মার নিত্যতা বিষয়ে উপদেশ দিলেন এবং অর্জুনের শোক, মোহ সমস্ত কিছু দূর করার চেষ্টা করলেন। এর পরবর্তীতে তিনি অর্জুনকে আত্মতত্ত্ব জ্ঞানী হয়ে উঠতে বলেছিলেন। অর্জুনের মনকে স্থির করার পরামর্শ দিয়েছিলেন যাতে সে স্থিতপ্রজ্ঞ হয়ে উঠতে পারে, ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করতে পারে এবং তাকে অবশ্যই স্বধর্মের পরামর্শ দিয়েছিলেন, নিষ্কাম কর্মের কথা বলেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম পালনের কথা অর্থাৎ তার ধর্ম অনুযায়ী কর্ম করা উচিত। ইন্দ্রিয়কে সংযম করে কর্ম করতে হবে অর্থাৎ কামনা, বাসনা, আসক্তি, আকাঙ্ক্ষা এই সমস্ত কিছু থেকে ইন্দ্রিয়কে সংযম করে তাকে ক্ষত্রিয়ের যা করণীয় সেই কর্ম করতে হবে। যারা জ্ঞানী ব্যক্তি তারা নিজেদের কর্ম করে থাকেন। এই স্বভাব বা স্বধর্ম বলতে বোঝায় মানুষ বিশেষ একটা প্রকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং সেই প্রকৃতিকে অনুসরণ করেই কর্ম করে। তার কারণ কেউ কর্ম না করে কখনো থাকতে পারে না। সবাইকে আমৃত্যু কর্ম করতে হয়। প্রকৃতি যেমন ত্রিগুনাত্তিকা তেমনি জীবের মধ্যে সত্ত, রজ, তমো গুণের প্রাধান্য থাকে। "প্রকৃতি সত্ত প্রধান হলে তা হয় ব্রাহ্মণ প্রকৃতি, রজ প্রধান হলে সেটি হলো ক্ষত্রিয় প্রকৃতি, তমো মিশ্রিত রজপ্রধান হলে সেটি হল বৈশ্য প্রকৃতি এবং রজ মিশ্রিত তমো প্রধান হলে সেটি হয় শূদ্র প্রকৃতি"।[6] প্রাচীন ভারতীয় সমাজে এই চার প্রকার বর্ণভেদ অনুসারী মানুষের করণীয় কর্ম নির্ধারিত হয়। যার মধ্যে তমো গুণ থাকে অর্থাৎ আলস্যতা কাজ করে তাই সে কখনোই রাজসিক বা সাত্ত্বিক কর্ম করতে পারবে না। কারণ সেই ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে কেবল বাহ্যিক অনুষ্ঠানে আবদ্ধ থাকতে হবে। তার অন্তরের কোন পরিবর্তন হবে না, এমন ধর্মের অনুষ্ঠান হল পরধর্মের চেয়ে ভয়াবহ। আবার যে রাজসিক ব্যক্তি সে কখনোই তামসিক ব্যক্তির সাথে কর্ম করতে পারবে না। যে সাত্বিক ব্যক্তির অধিকারী, সে কখনোই

রাজসিক এবং তামোসিক কর্ম করতে পারবে না, কারণ সাত্ত্বিক ব্যক্তির মধ্যে সরলতা, লঘুতা, সত্যবাদিতা, নির্লোভ কাজ করে, রজগণ চঞ্চল প্রকৃতির হয় এক্ষেত্রে ব্যক্তির মন স্থির থাকে না, অথবা বলা যায় চিত্তে নিবিষ্ট থাকেনা, তমাগুনে ব্যক্তির অলসতা কাজ করে। সাত্তিক কর্মের ফল নির্মল হয়, মুক্তি এবং স্বর্গ লাভ হয়। রাজসিক কর্মের ফল দুঃখ অর্থাৎ মন্দ কর্মের জন্য মানুষকে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয় এবং তামশিক কর্মের ফল বিবেকহীনতা হয়, মোহ, অজ্ঞানতা, আলশ্যতা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং নিজের গুণ ও ধর্ম অনুযায়ী যদি কেউ কাজ না করে তাহলে পরধর্মের চেয়ে সেটি ভয়াবহ হয়-এই ক্ষেত্রে যে শ্লোকটির কথা উঠে আসে সেটি হল-

"শ্রেয়ান স্বধর্ম বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বঅনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধণং শ্রেয়ঃ পরধর্ম ভয়াবহঃ" ।।[7] (গীতা-৩/৩৫)

অর্থাৎ অর্জুন যেহেতু ক্ষত্রিয় তাই তার ধর্ম হলো রাজ্য শাসন ও রক্ষণ, শিষ্টের পালন এবং দুষ্টের দমন। এইসব কাজের জন্য যুদ্ধের প্রয়োজন, তাই যুদ্ধ করা হলো অর্জুনের স্বধর্ম। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে অর্জুনের মনে হয়েছিল যে নিজের আত্মীয় পরিজনের সাথে যুদ্ধ করা পাপ। এই সময় শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ হলো, যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয় তার কাছে যুদ্ধ করা কর্তব্য, যদি সেটি আত্মীয় পরিজনের সাথেও হয় বা অন্য কারো সাথে হয় তাহলেও তাতে কোন পাপ হবে না কারণ এটি তার স্বধর্ম। এই স্বধর্ম পালনে যদি মৃত্যুবরণও হয় তাহলেও সেটি পরধর্মের থেকে ভালো। স্বধর্ম যদি ত্যাগ করা হয় এবং পরধর্ম গ্রহন করা হয় তাহলে ব্যক্তির অকল্যান হয় এবং সমাজেরও অকল্যাণ হয়। তাই সমাজের কল্যাণের জন্য মানুষের নিজের স্বধর্ম অনুযায়ী কর্ম করা হল একান্ত কর্তব্য। তাই অর্জুনের যুদ্ধ করা হলো তাঁর স্বধর্ম এবং তাঁর করণীয় কর্ম। স্বধর্ম অর্থাৎ বর্ণ অনুযায়ী কর্ম করার কথা বলা হয়েছে নচেৎ বর্ণ বিচ্যুতি ঘটবে। প্রাচীন কালে দুটি মার্গের বা পথের উল্লেখ করা হয়েছে যথা- প্রবৃত্তি মার্গ এবং নিবৃত্তি মার্গ। ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন করে কর্ম করা উচিত অর্থাৎ নিবৃত্তি মার্গ গ্রহণ এবং প্রবৃত্তি মার্গ বর্জন। প্রবৃত্তি মার্গ হল কাম্য ফল লাভের জন্য অনুসরণীয় পথ এবং নিবৃত্তি মার্গ হলো বিষয়বাসনা শূন্য করে, ইন্দ্রিয় সুখ ত্যাগ করে যে কর্ম করা হয়। নিষ্কাম ভাবে কর্ম করতে গেলে ইন্দ্রিয়সুখ ত্যাগ করে, বিষয়বাসনার প্রতি আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে, ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন করে, অহংঅভিমান ত্যাগ করে অর্থাৎ সমস্ত কিছুতেই 'আমি সব' এইরকম 'আমি' কেন্দ্রিক মনোবৃত্তি ত্যাগ করে কর্ম করার কথাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন কে বলেছেন। যদি 'আমি' কেন্দ্রিক মনোভাব থাকে তাহলে বন্ধন ঘটবে। এই নিষ্কাম ভাবে কর্ম করতে গিয়ে যদি তার মৃত্যু ঘটে তাহলেও সেটি সকাম কর্মের থেকে অনেক ভালো যেহেতু অর্জুন যুদ্ধকে পাপ বলে মনে করেছিলেন।

অহিংসা নীতি গীতার মান্য, কিন্তু গীতা বলে অহিংস হয়েও যুদ্ধ করা উচিত। আবার স্থিতপ্রজ্ঞ হয়েও যুদ্ধ করা চলে। তার কারণ হিংসা ও অহিংসা হল বুদ্ধিতে, কর্মে নয়। "জীবের মধ্যে যে অস্ফুট সদ্ভাব অর্থাৎ তার মধ্যে কোনরকম আসক্তি, আকাঙ্ক্ষা, কামনা বাসনা না থাকা, তার প্রকাশ ঘটে তার কর্মে। সুতরাং তার কর্ম ঈশ্বরমুখী হলে সেটা বিশুদ্ধ হয়ে নিষ্কাম কর্মযোগ হয়"।[8] ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, যোগস্থ হয়ে ফলাশক্তি অর্থাৎ ফলের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করে সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিকে সমান জ্ঞান বা তুল্য জ্ঞান করে কর্ম করতে হবে অর্থাৎ সমস্ত কিছুতে সমত্ত বুদ্ধি আরোপ করতে হবে। গীতায় অনেক ক্ষেত্রে 'যোগ' শব্দটি কর্মযোগ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। এই যোগ হল ঈশ্বর প্রাপ্তির উপায় বা মার্গ। গীতায় 'যোগ' বলতে শুধুমাত্র যুক্ত হওয়াকে বোঝায় না, যোগ হলো সমস্ত

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-I, Issue-2, July-December 2025

বুদ্ধি বা সাম্যবুদ্ধি এবং কর্মের কৌশল। কিভাবে সমত্ত বুদ্ধি কে আরোপ করা যায় তারই কৌশল হল যোগ। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন যে জীবাত্মা থেকে পরমাত্মায় উত্তরণ যেখানে কামনা, বাসনা কোন কিছুকে না পাওয়ার অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন করে মোহ, বৈরাগ্য ত্যাগ থেকে নিজেকে পরিত্যক্ত করে সেই পথে যাওয়া যায় এবং অবশ্যই সেই পথটি হল যোগ। অর্জুনের কর্মের মধ্যে নিষ্কামতা ছিল। শ্রীকৃষ্ণ তাকে বারবার বলেছেন জ্ঞানী হয়েও কর্মযোগী হওয়া যায়। কারণ তিনি কর্মেরই প্রেরণা দিয়েছেন অর্জুনকে কিন্তু আবার জ্ঞানের উপদেশ দিয়েছেন। যে জন্মায় সে তো মরবেই, যেটা অনিবার্য তার জন্য কখনোই শোক করা উচিত নয়। তাই বলা হয়েছে-

"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মদপরিহায্যে হথে ন ত্বং শোচিতমুহর্ষি" ।।[৭] (গীতা-২/২৭)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে অর্জুন ছিল নিমিত্র মাত্র। যেটা অপ্রতি বিদেহ যেটা অবশ্যকরণীয় বা যেটি আবশ্যিক ঘটবে তার জন্য কখনো শোক করা উচিত নয়। যার প্রতিকার অসম্ভব তার জন্য শোক করা মূর্খামি।

নিষ্কাম কর্মের দুটি উদ্দেশ্যের কথা গীতায় আছে, যথা প্রথমটি হল- নিষ্কাম কর্ম হলো যোগ সাধন মার্গ। এই কর্ম ভোগের জন্য নয়, এই কর্ম যোগের জন্য। সমত্ত বুদ্ধি আরোপ করে, কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করে যে কর্ম দ্বারা সিদ্ধি লাভ হয় সেই কর্ম হলো নিষ্কাম কর্ম। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো- নিষ্কাম কর্মের দ্বারা সৃষ্টিরক্ষা হয় বা লোকরক্ষা হয়। অর্থাৎ কর্মেই সৃষ্টি, কর্ম দ্বারা সৃষ্টিরক্ষা এবং এই কারণে প্রকৃতি সকলকে কর্ম করায়। এই বিচিত্র জগত প্রকৃতির লীলা এবং জীব প্রকৃতির খেলায় অংশগ্রহণ করে। জগতের ধারন পোষণের জন্যই এই কর্মের সৃষ্টি হয়েছে। এ জগতে সমস্ত জীব কে কর্মে অনাসক্ত হয়ে সমস্ত কিছুকে ঈশ্বরের কাছে অর্পণ করে সমত্ত বুদ্ধি আরোপ করা হয় তাহলে সেই কর্মই হবে যথার্থ কর্ম, সেই কর্মে কোনরকম বন্ধন হয় না। যারা আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি তাদের নিজস্ব কোন কর্ম নেই, তাদের কর্ম হলো লোকের জন্য অর্থাৎ লোক শিক্ষার জন্য কর্ম। তাহলে এখানে অর্জুনের প্রশ্ন হল যে, যদি কর্মের থেকে সমত্ত বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হয় তাহলে শ্রীকৃষ্ণ কেন তাকে হিংসাত্মক কর্মে নিযুক্ত করেছেন? এখন প্রশ্ন হচ্ছে, জ্ঞানী ব্যক্তিও কর্ম করেন, আবার অজ্ঞানী ব্যক্তি তিনিও কর্ম করেন, কিন্তু এদের দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? যারা অজ্ঞানী ব্যক্তি তারা মনে করেন যে, কর্ম একমাত্র আমি করি, আমি কর্তা অর্থাৎ তাদের মধ্যে আমিত্ব ভাব প্রবল। আর যারা জ্ঞানী ব্যক্তি তারা মনে করেন কর্ম করেন প্রকৃতি কারণ প্রকৃতিতে বসবাসকারী সকল মানুষ কর্ম করেন, কর্ম না করে কেউ থাকতে পারে না। অজ্ঞানী ব্যক্তিরা কামনা-বাসনা যুক্ত হন, তাদের মধ্যে অহংকার বোধ থাকে অর্থাৎ তারা কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করতে পারে না। কামনা, বাসনা পূরণের জন্য কর্ম করা হয় আবার কামনা নিবৃত্তির জন্য কর্ম করা হয়। সাধারণ ব্যক্তি কামনা পূরণের জন্য কর্ম করে কিন্তু জ্ঞানীরা আত্মতত্ত্ব লাভ করে আসক্তি ত্যাগ করে কর্ম করে। তাই যখন তারা অর্থাৎ অজ্ঞানী ব্যক্তিরা কর্তৃত্তাভিমান ত্যাগ করতে পারে না তখন তারা মনে করে আমি কর্তা, আমিই ভোক্তা তাই তাদেরকে বারংবার এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে হয়। কারণ তারা যে কর্তব্য কর্ম করে থাকেন সেই কর্মের ফল ভোগ তারাই করেন। অপরদিকে যারা জ্ঞানী ব্যক্তি তাদের মধ্যে অহংবোধ, নিজেদেরকে কর্তা বলে মনে করার বাসনা, কামনা, আকাঙ্ক্ষা, ফলের প্রতি আসক্তি থাকে না, তাই তারা মোক্ষের দিকে এগিয়ে যায় এবং তারা ঈশ্বরের কাছে সমস্ত কিছু অর্পণ করে। অজ্ঞানীর কর্ম হলো ভোগ আর জ্ঞানীর কর্ম হলো যোগ।

শুধু কর্ম করলেই কর্মযোগী হওয়া যায় না, কারণ অহংকার, নিজেকে আমিত্বের মনোভাব বা কর্তা বলে মনে করার বাসনা অর্থাৎ কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ পরিহার না করে কর্মযোগে পরিণত হওয়া যায় না। তাহলে প্রশ্ন হল, এই কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ কে করতে পারে? এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে, যার মধ্যে কোন অহংকার নেই, কামনা-বাসনা নেই অর্থাৎ যিনি আত্মজ্ঞানী, যার মধ্যে আত্মার স্বরূপ বোধ আছে সেই ব্যক্তি একমাত্র আমিত্ববোধ বা অহংকার বোধ ত্যাগ করতে পারে। মমতাশূন্য এবং অহংকার শূন্য হয়ে কর্ম করতে হবে, ইন্দ্রিয় সংযম রেখে কর্ম করতে হবে। ইন্দ্রিয় সুখ, কামনা-বাসনা, আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি যুক্ত হয়ে যে কর্ম করা হয় সেই সকাম কর্ম মানুষকে ছেড়ে আসতে হবে, তবেই সে এক নিষ্ক্রিয় পুরুষ। যে সকাম কর্মের কথা বলা হয়েছে সেই সকাম কর্ম হল অজ্ঞানের, যে কর্মের বীজ হলো কামনা-বাসনা এবং বন্ধন হল এই কর্মের ফল। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম হল সকাম কর্মের বিপরীত। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন অর্জুন যেহেতু ক্ষত্রিয় তাই তার ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম করাই অবশ্য করণীয়, যে কর্ম হলো যুদ্ধের একটা বিরাট হত্যাকান্ড, সেই কর্মে যদি মৃত্যুবরণ হয় তাও সেটি সকাম কর্মের থেকে শ্রেয়। নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারা কর্ম করলে সেটা কখনো বিফল হয় না, কিন্তু সকাম কর্ম ব্যর্থ হতে পারে কারণ যে ফলের আশা করে আমরা কাজটা করি, সেই ফল যখন পাই না তখন সকাম কর্ম ব্যর্থ হয়ে থাকে। নিষ্কামকর্মে কোন অঙ্গহানি জনিত পাপ হয় না, যেটি সকাম কর্মে হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তার কর্তব্যকর্ম করতে বলেছেন এবং তিনি অর্জুনকে যে উপদেশগুলি দিয়েছেন সেগুলি হল-

i.কর্ম করো

ii.কর্মফলের আশা করো না, আশা বিহীন কর্ম করাই সকল মানুষের উচিত।

iii.ফলের কামনায় কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া যাবে না।

iv.ফলের কামনায় কর্মে নিবৃত্ত হবে না।

v.কামনাশূন্য, মমতাশূন্য এবং অহংকার বোধ বা নিজের আমিত্ববোধকে ত্যাগ করে সমত্ত বুদ্ধি আরোপ করে অর্থাৎ সমস্ত কিছুতে লাভ-অলাভ, জয় পরাজয় কে তুল্য জ্ঞান করে কর্ম করতে হবে।

গীতায় একমাত্র কর্মের প্রকৃত নীতি স্পষ্ট করে বোঝানো হয়েছে। আমরা প্রতিনিয়ত যে সমস্ত কর্ম করে থাকি সেটি হল সকাম কর্ম। তার কারণ কর্মের পশ্চাতে আমাদের কামনা থাকে, আকাঙ্ক্ষা থাকে, আমরা আমাদের স্বার্থ অনুযায়ী কর্ম করি, আমরা ফলের চিন্তা করে কর্ম করি অর্থাৎ যদি একটি উদাহরণ দিই তাহলে বিষয়টি পরিস্ফুট হয়- অনাবৃষ্টিতে অর্থাৎ খরা বা বন্যার সময় বৃষ্টি কামনার জন্য কারিরী যোগ্য করা হতো, এই যোগ্য হল সকাম কর্ম, কারণ এখানে বৃষ্টিরূপ ফলের কামনা করা হয়েছে। গীতায় যে কর্মযোগের কথা বলা হয়েছে সেখানে কর্ম এবং যোগ এই দুটি শব্দ আলোচনা করা হয়েছে। কর্ম বলতে কোন কিছু করা এবং যোগ হল "যোগঃ কর্মসু কৌশলম" অর্থাৎ কর্ম করার কৌশল হল যোগ। যিনি জনক অর্থাৎ পিতা তিনি সন্তান উৎপাদন করেছেন কোন স্বার্থসিদ্ধি না করে- এই ভাবেই স্বার্থসিদ্ধি না করে কর্ম করার কথা বলা হয়েছে। জনক রাজাগণ সকলেই কার্য করে সিদ্ধি লাভ করেছেন এমনকি তিনি নিজেও এই কর্মে ব্যাপৃত, তাই অর্জুনের ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম করাই উচিত। নিষ্কাম কর্মের যে তিনটি লক্ষণ সেগুলি হল-

i.সর্বকর্ম ঈশ্বরের সমর্পণ করা

ii.ফলের প্রতি আকাঙ্ক্ষা বর্জন পূর্বক কর্ম করা।

iii.কর্তৃত্বের অভিমানকে ত্যাগ করা।

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-I, Issue-2, July-December 2025

এভাবে যদি কর্ম করা যায় লোকের উপকার করার জন্য তাহলে ধর্মের জয় এবং অধর্মের ক্ষয় হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যার মধ্যে ছয়টি ভগ আছে অর্থাৎ ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য-তিনি অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন নিষ্কাম কর্মের স্বপক্ষে। তাঁর দৃষ্টিতে অর্জুনের কর্মের মধ্যে নিষ্কামতা ছিল, তার মধ্যে মোহ, শোক থাকার ফলে সে বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন, জ্ঞানী হয়েও কর্মযোগী হওয়া যায়। কিন্তু অর্জুনের এক্ষেত্রে প্রশ্ন ছিল, একবার তাকে জ্ঞানী বলা হচ্ছে, একবার কর্ম করার কথা বলা হয়েছে। তাহলে এক্ষেত্রে কোনটি শ্রেয় জ্ঞান নাকি কর্ম? এক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ তাকে বলেন প্রথমে তাকে জ্ঞানী হতে হবে এবং তারপর তার কর্তব্যকর্ম পালন করতে হবে। কারণ যদি সে জ্ঞানী না হয় তাহলে নিষ্কাম কর্ম তার পক্ষে করা সম্ভব হবে না, ফলত মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটবে না। গীতায় বলা হয়েছে "সহস্র সহস্র মানুষের মধ্যে কৃচিৎ দু একজন সিদ্ধি লাভে যত্নশীল হন তারা আত্মজ্ঞানী ব্যাক্তি, সেই সমস্ত ব্যক্তি সিদ্ধিলাভকরে অর্থাৎ ব্রাম্ভীস্থিতি লাভ করে এবং যারা ব্রাম্ভীস্থিতি লাভ করে তারাই ঈশ্বরকে জানে (knows me in all the principles of my existence)"।[10] চতুর্থ অধ্যায় জ্ঞানযোগ সেখানে দেখা যায় যে, যে ব্যক্তি জ্ঞানী তার কর্মবন্ধন নেই কিন্তু যে ব্যক্তি অজ্ঞানী তার কর্মের বন্ধন আছে অর্থাৎ যিনি কর্মে অকর্ম দর্শন করেন তিনি কর্ম করেও মনে করেন যে আমি কিছু করিনি, সেই ব্যক্তি বুদ্ধিমান কারণ সেই ব্যক্তির আমিত্ববোধ, কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ বর্জন হেতু তার কর্ম অকর্ম স্বরূপ হয়। বস্তুত যিনি ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জিত হয়ে, কামনা-বাসনা বর্জন করে সমত্ত বুদ্ধি অর্থাৎ লাভ-অলাভ জয়-পরাজয়কে তুল্য জ্ঞান করে কর্ম করেন তার চিত্ত ব্রহ্মজ্ঞানে অবস্থিত হয়। তিনি যদি লোকের জন্য অর্থাৎ লোকসংগ্রহার্থে কর্ম করে থাকেন তাহলে সেই কর্ম কখনোই বন্ধনে পরিণত হয় না, কিন্তু যে ব্যক্তি সমত্ত বুদ্ধি লাভ করতে জানেন না সেই ব্যক্তির কর্ম বন্ধন ঘটে এবং তাকে বারবার ফল ভোগের জন্য পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়। এই কর্মতত্ত্ব বড় দুরূহ বিষয়। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন কে বলেছেন "অজ্ঞানসম্ভূত হৃদয়স্থ সংশয়রাশি জ্ঞানরূপ খরগদ্বারা ছেদন করে নিষ্কাম কর্ম কর, স্বধর্ম পালন কর, যুদ্ধ কর এতে পাপ স্পর্শীবে না"।[11] যে নিষ্কাম কর্মের কথা আলোচনা করা হয়েছে সেই কর্ম করলে মানব জীবনের পরম পুরুষার্থ অর্থাৎ নিঃশেষ বা মুক্তি লাভ সম্ভব।

২

আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কিন্তু সমাজ বলতে যা বোঝায় আমাদের এই সমাজ গীতার ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে এবং যে ভিত্তির কথা বলা হচ্ছে তা হলো বর্ণাশ্রম ধর্ম একদিকে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। অন্যদিকে আশ্রম ধর্ম। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস। যে পরিচিতি আসুক না কেন যে অবস্থাতেই ব্যক্তি থাকুক না কেন তাকে তার বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুযায়ী কর্ম করতে হবে।

বর্তমানে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে কর্ম করার সময় যেন আমরা ফলের প্রতি আসক্ত না হয়ে পড়ি। এই প্রসঙ্গে নিষ্কাম কর্মে গীতার কর্মযোগে প্রবৃত্তির মার্গ এবং নিবৃত্তি মার্গ এই দুটি মধ্যপন্থা দেখা যায়। প্রবৃত্তি মার্গ বলে সমাজে থেকে সমাজস্থ কর্ম করাই উচিতকর্ম। সেখানে ফল ত্যাগের কথা বলা হয়নি। অপরদিকে নিবৃত্তি মার্গ কর্ম সন্ন্যাসের কথা বলেছে অর্থাৎ মানুষের সকল প্রকার ফল ত্যাগ করে নিরাশক্ত হয়ে থাকা হল নিবৃত্তি মার্গ। তাহলে বর্তমানে আমরা যে কর্ম করি তার পশ্চাতে কি কোন উদ্দেশ্য নেই? কারণ আমরা সমস্ত কাজই কোন না কোন স্বার্থ বা উদ্দেশ্য সিদ্ধি করেই করে থাকি। এর ফলে আমরা

কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হই কিন্তু নিষ্কাম কর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদেরকে বর্তমান সমাজে এই বার্তা দিতে হবে যে, কোনভাবে ফলের প্রতি আসক্ত হওয়া যাবে না, ফলস্বরূপ কর্মের বন্ধন সৃষ্টি হবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি কর্মযোগী তার কি কোন উদ্দেশ্য নেই? এখানে বলা হয়েছে তার দুটি উদ্দেশ্য একটি হল চিত্ত শুদ্ধি করা এবং দ্বিতীয়টি হল ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সিদ্ধি। প্রথমে চিত্ত কে অভ্যাস, বৈরাগের দ্বারা শুদ্ধিকরণ করতে হবে। আমরা জানি, অপরিচ্ছন্ন দর্পণে নিখুঁত ছবি দেখা যায় না সেই দর্পণ যদি স্পষ্ট বা পরিচ্ছন্ন থাকে তবেই আমরা আমাদের প্রতিবিম্ব দেখতে পাই। তেমনই চিত্তের শুদ্ধিকরণ না ঘটলে অর্থাৎ চিত্ত কলুষিত থাকলে সেই চিত্তের দ্বারা নিষ্কাম কর্ম করা সম্ভব নয়। তাই চিত্তকে অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা শুদ্ধ করতে হবে। দ্বিতীয়টিতে বলা হয়, কর্মকে যোগে পরিণত করতে হবে অর্থাৎ আমার কোন কর্তব্যকর্ম নেই, সব কর্ম ঈশ্বরের, ঈশ্বরের ইচ্ছাতে আমি কর্ম করছি তাই বলা হয় 'যোগস্থ কুরু কর্মানি'। মানুষকে এইভাবে নিজেদেরকে পরিচালনা করতে হবে এর ফলে আর কর্মের বন্ধন সৃষ্টি হবে না। সুতরাং এই 'যোগ' শব্দটিকে আমরা এভাবে আলোচনা করতে পারি যে, প্রথমে, ঈশ্বরের সঙ্গে বুদ্ধি কে সংযুক্ত করা। দ্বিতীয়ত, সমস্ত কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করা এবং তৃতীয়তঃ, সমত্ত বুদ্ধি লাভ করা অর্থাৎ জয়ে তার আনন্দ নেই, দুঃখ নেই, আবার পরাজয়েও তার আনন্দ নেই, দুঃখ নেই, সবকিছুকে সমানভাবে দেখতে হবে। সুতরাং এখানে কর্মযোগের ফল হলো মুখ্য বিষয়। বর্তমান সমাজে আমি ধনী, আমি জ্ঞানী, আমার ধন-সম্পত্তি, আমি কর্তা, আমি জ্ঞাতা ইত্যাদি ব্যক্তিগত অহংবুদ্ধি বা অহম্ -বোধকে বিলুপ্ত করতে হবে। সকলের উচিত নিঃস্বার্থভাবে, আকাঙ্ক্ষা বর্জিত ভাবে নিজের আমি কর্তৃক যে মনোভাব তাকে ত্যাগ বশত কর্ম করা, তবেই সেই কর্ম হবে বর্তমান সমাজে আদর্শ কর্ম এবং সেই কর্মই হলো নিষ্কাম কর্ম। তার ফলস্বরূপ আমাদের যে আধুনিক সমাজ সেই সমাজ শান্তি-শৃঙ্খলা, হিংসা, বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হবে। আমাদের নিষ্কাম কর্মের বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা হিসেবে এই বার্তা সকলকে দিতে হবে যে সমস্ত ব্যক্তি যেন প্রাকৃতিক বিষয়ে বিচলিত না হয়। মানুষ যেন কোনোভাবে সকাম কর্মের দ্বারা বন্ধনে আবদ্ধ না হয়, তাকে নিষ্কাম কর্ম করতে হবে তাতেই মুক্তি লাভ সম্ভব। সাধারণ মানুষের কল্যাণে জনগণের রক্ষার্থে কর্ম করতে হবে সেটি হল লোকসংগ্রহ এবং যে যোগী তিনি হলেন যোগারূঢ়। সুতরাং সমাজের অজ্ঞানী ব্যক্তিদের জ্ঞানের পথে আনতে হবে, তাদের আত্মজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান বিষয় সচেতন করতে হবে। এই তত্ত্বজ্ঞানে কোন জড়তা নেই, বিকার নেই, অপবিত্রতা নেই। আমরা কখনোই কর্মহীন হয়ে থাকতে পারবো না। আমরা যেহেতু সর্বক্ষেত্রে সুখ, শান্তি খুঁজে বেড়াই সেহেতু শরীর ও মনের ক্রিয়াকে সংযত এবং নিয়ন্ত্রিত করাই হলো কর্তব্য ও যুক্তিযুক্ত। আবার আসক্তি বসত কোন মঙ্গলজনক কাজ যদি করা হয় সেই ক্ষেত্রেও মানুষকে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, যেমন দার্শনিক কান্ট বলেছিলেন 'Duty for duty's sake' কর্তব্য অনুযায়ী কর্ম পালন করা উচিত। অর্থাৎ কর্মের জন্য কর্ম করতে হবে। ফল লাভের উদ্দেশ্যে বা স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কর্ম না করাই শ্রেয়। আমরা যদি ইন্দ্রিয়কে সংযম করতে না পারি তাহলে আমাদের পক্ষে যোগ সাধনা সম্ভব নয় এবং সেই সাধনে যদি নিষ্কামতা না থাকে তাহলে আমাদেরকে বিষয় ভোগে ব্যাপৃত থাকতে হবে। আমাদের অন্তর্নিহিত আসক্তি, আকাঙ্ক্ষা লোভে পরিণত হয়, লোভ থেকে পাপ এবং পাপ থেকে মৃত্যু ফলতঃ আবার পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয়। স্বার্থসিদ্ধি করে কর্ম করা গীতায় কর্মের বিষয় নয়। স্বার্থ থাকলে

বন্ধন ঘটে, আমাদেরকে এই বন্ধন ভেঙে দিয়ে মোক্ষ লাভের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। সকাম কর্ম আসক্তি সৃষ্টি করে, আসক্তি থেকে কামনা, কামনা বাধা পেলে ক্রোধ সৃষ্টি হয়, ক্রোধ থেকে মোহ এবং মোহ থেকে স্মৃতি নাশ হয়। আমাদের সমাজকে এই শিক্ষা গীতা দিয়েছে যে, কর্ম যদি অত্যাবশ্যক হয় তাহলে নিষ্কাম কর্ম করাই শ্রেয়। গীতা হল মোক্ষশাস্ত্র কারণ যে শাস্ত্র অনুধাবন করলে মানুষের মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটে, যে শাস্ত্রকে জীবনে ঠিকমতো পালন করলে মানুষ কে পাপের ভাগীদার হতে হয় না, ঈশ্বরের নিকটে সমস্ত কিছু অর্পণ করে সে মুক্তি লাভ করে। তাই পরিশেষে বলতে হয় গীতার শেষকথা হল "সর্বধর্মাণ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" ।[12] অর্থাৎ যে কোন ধর্মের মানুষই হোক না কেন সে যদি কর্ম করে এমনকি তার চিত্ত ঈশ্বরে নিবিষ্ট হয় এবং সে যদি ঈশ্বরে সমস্ত কিছু অর্পণ করে তাহলে ইহ সংসারের যে শেকড় সেটি উৎপাটিত হয়। ফলস্বরূপ সেই ব্যক্তিকে জন্ম চক্রের আবর্তনে আর আসতে হয় না। এই গীতা শাস্ত্র কে রাষ্ট্রীয় গুরুত্ব দিয়ে উঁচু, নিচু, ভেদভাব, কলহ পরম্পরায় বিশ্বের সকল মানুষকে শান্তি প্রদানের চেষ্টা করা হোক এবং নিষ্কাম কর্মই হোক বিশ্বের সকলের পাথেয়।

উপসংহার:

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার 'নিষ্কাম কর্ম' থেকে আধুনিক 'কর্মনৈতিকতা' বা Work Ethics-এ উত্তরণের এই তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিশ্লেষণ শেষে আমরা এক সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। এই গবেষণা স্পষ্ট করেছে যে, গীতার দর্শন কোনো প্রাচীন যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন নয়, বরং এটি সমকালীন কর্মজীবনের সংকট মোকাবিলার এক জীবন্ত ও কার্যকরী হাতিয়ার। নিষ্কাম কর্ম মানে কর্মের প্রতি অনীহা বা উদাসীনতা নয়; বরং এটি হলো কর্মের ফলাফলের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করে কর্তব্যের প্রতি একনিষ্ঠতা। আধুনিক যুগে যখন কর্মীরা মানসিক চাপে জর্জরিত, তখন গীতার এই দর্শন তাদের 'ফলাফল-কেন্দ্রিক দুশ্চিন্তা' থেকে মুক্ত করে 'প্রক্রিয়া-কেন্দ্রিক একাগ্রতা' প্রদান করে। এটিই আধুনিক কর্মনৈতিকতার মূল চাবিকাঠি। সকাম কর্ম বা ফলাফলের প্রতি অত্যধিক আসক্তি মানুষের বিচারবুদ্ধি আচ্ছন্ন করে দেয়, যা অনৈতিক কাজের প্ররোচনা দেয়। অন্যদিকে, নিষ্কাম কর্মীর চিত্ত থাকে প্রশান্ত (স্থিতপ্রজ্ঞ), যা তাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও নৈতিক মানদণ্ড বজায় রাখতে সাহায্য করে। সুতরাং, গীতার দর্শন কেবল আধ্যাত্মিক মুক্তি নয়, বরং কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিরও একটি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি।

একবিংশ শতাব্দীর এই যান্ত্রিক ও প্রতিযোগিতা-মুখর বিশ্বে দাঁড়িয়ে 'নিষ্কাম কর্ম থেকে কর্মনৈতিকতা'-র এই পুনর্মূল্যায়ন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। আধুনিক ম্যানেজমেন্ট বা নীতিবিদ্যা যেখানে মানুষকে 'সম্পদ' (Resource) হিসেবে দেখে, গীতা সেখানে মানুষকে 'সম্ভাবনা' হিসেবে দেখে। তাই বলা যায়, গীতার নিষ্কাম কর্মতত্ত্ব আধুনিক কর্মজীবনের জন্য কোনো বিমূর্ত আদর্শ নয়, বরং একটি অপরিহার্য প্রায়োগিক দর্শন। ব্যক্তিগত প্রশান্তি, পেশাগত উৎকর্ষ এবং একটি দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে গীতার এই শ্বাশত বাণীকে সমকালীন প্রেক্ষাপটে গ্রহণ করাই হোক আজকের কর্মনৈতিকতার মূল লক্ষ্য।

তথ্য নির্দেশ:

1. গীতা- ৩/৫
2. গীতা- ২/৪৭
3. গীতা-২/৩৮
4. ভট্টাচার্য, ডঃ সমরেন্দ্র, ভারতীয় নীতিশাস্ত্র, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৩৬।

5. রায়, শ্রী অনিলবরণ, শ্রী অরবিন্দের গীতা, তৃতীয় খন্ড, শ্রী বিভূতিভূষণ রায়, গীতা-প্রচার কার্যালয়, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৭।
6. ভট্টাচার্য, ডঃ সমরেন্দ্র, ভারতীয় নীতিশাস্ত্র, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৩৬।
7. গীতা-৩/৩৫
8. রায়, শ্রী অনিলবরন, শ্রী অরবিন্দের গীতা, দ্বিতীয় খন্ড,ডি, এম, লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ৬৩-৯০।
9. গীতা-২/২৭
10. রায় চৌধুরী, অমিত, গীতা অনুবাদক, পৃষ্ঠা-৩।
11. ঘোষ, চন্দ্র, শ্রীজগদীশ, শ্রী গীতা, প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ১৭৪।
12. গীতা- ১৮/৬৬

<u>গ্রন্থপঞ্জি</u>

1. ঘোষ, চন্দ্র, শ্রীজগদীশ, শ্রী গীতা, প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী, কলকাতা।
2. ভট্টাচার্য, ডঃ সমরেন্দ্র, ভারতীয় নীতিশাস্ত্র, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।
3. রায়, শ্রী অনিলবরণ, শ্রী অরবিন্দের গীতা, তৃতীয় খন্ড, শ্রী বিভূতিভূষণ রায়, গীতা- প্রচার কার্যালয়, কলকাতা।
4. রায়, শ্রী অনিলবরণ, অরবিন্দের গীতা, প্রথম খন্ড, ডি,এম, লাইব্রেরী, কলকাতা।
5. রায়, শ্রী অনিলবরন, শ্রী অরবিন্দের গীতা, দ্বিতীয় খন্ড,ডি, এম, লাইব্রেরী, কলকাতা।
6. রায় চৌধুরী, অমিত, গীতা অনুবাদক